শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৪, ৯ম সংখ্যা, ১ ভাদ্র ১৪১৭ (১৮ আগষ্ট ২০১০) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

‘স্বাধীনতার দিন নিজের হাতে তৈরী পতাকা উড়িয়েছিলাম’

তিনি কারও মা, কারও ঠাকুমা, দিদিমা, কারো বা আদরের মাসিমা। নাতি নাতনি নিয়ে ভরা সংসার। জীবনকে ভালোবেসে, মানুষকে ভালবেসে জীবনের ৯৫টি বসন্ত পার করে এসেছেন। বয়স তাঁর শরীরকে কাবু করেছে কিন্তু কাবু করতে পারেনি তাঁর স্মৃতিতে ভরপুর মনটাকে যে স্মৃতিতে অমলিন আজও সারা জীবনের নানা খুঁটিনাটি ঘটনার অবাক করা ঘনঘটা। শিবপুরের অম্বিকা ঘোষাল লেনের বাসিন্দা রমা দে হাজরার স্মৃতিতে স্পষ্ট ধরা আছে ১৯৪৭এর স্বাধীনতার দিনটির কথা। তাঁর কথায় ‘‘তখন আমরা থাকতাম খুরুট পঞ্চাননতলায়। সেসময় তো মেয়েদের বাইরে বেরোনোর চল ছিলনা। আগের রাতে পর্দার আড়াল থেকে শুনলুম রেডিওয় জওহরলালের ভাষণ। সারা রাত রাস্তায় লোকের ভীড়। সকালে উঠেই ঠিক করলুম পতাকা ওড়াতে হবে। আশেপাশের কিছু বউ মেয়ে জুটে গেল। ঠিক করে ফেললুম নিজেই পতাকা বানাব। তিনটুকরো সাদা কাপড় কাটা হল। বাগান থেকে শিউলি ফুল তুলে তার বোঁটা বেটে তৈরী হল গেরুয়া রং, আমপাতা বেটে সবুজ রঙ। সেই রঙে কাপড় ছুপিয়ে, শুকিয়ে, কাজলের ভুসোকালি দিয়ে হাতে আঁকা হল চক্র। তারপর হাতে সেলাই করে ছাদে নিয়ে গিয়ে বাঁশের কঞ্চিতে লাগিয়ে উড়িয়ে দিলাম সেই পতাকা। সে যে কি আনন্দ তোমাদের বোঝাতে পারব না।’’

সেকালের সিভিল সার্জেন ডাঃ সতীশ চন্দ্র মিত্র ও শর্বানীদেবীর তিন পুত্র ও ছয়কন্যার চতুর্থ রমার জন্ম বিহারের পূর্ণিয়ায়। বদলীর চাকরীর জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ঘোরার কারণে রমার প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভের সুযোগ হয়নি। কিন্তু তাঁর উৎসুক মন, তীক্ষ্ণ মেধা ও চট করে শিখে নেবার ক্ষমতা তাঁকে বিচক্ষণ, কুশলী ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী হতে সাহায্য করেছিল। এই শিক্ষার মূলে ছিল তাঁর বড়দাদা শুধাংশুভূষণের উৎসাহ যিনি ছিলেন এক জীবন্ত Encyclopaedia। তাই স্কুলের গন্ডি না পেরোলেও সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, আবৃত্তি, সমসাময়িক রাজনীতি সবই ছিল রমার করায়ত্ত। দেখেছেন গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথকে। নিজের জীবনকে গড়ে নিয়েছেন তাঁদের আদর্শে।

বিয়ে হয়েছিল শিবপুরের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিবেকানন্দ দে হাজরার সঙ্গে। তাঁর শ্বশুরমশাই সুরেশচন্দ্র ছিলেন আর্য সমাজের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাবশিষ্য। ধর্মীয় আচারের আধিক্যে পরিবারের স্বাধীনতার উল্লাস বা উচ্ছ্বাসের প্রভাব খুব একটা ছিলনা যদিও এই পরিবারের এক সদস্য যামিনীমোহন ঘোষ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও দেশবন্ধুর প্রেরণায় প্রথম স্বদেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন।

‘‘তখন বাড়ীতে অনেক কাজ করতে হত। রান্নাবান্না ছাড়াও গরু ছিল - তাদের দেখভাল করা, আত্মীয়স্বজনদের আপ্যায়ন সবই করতে হত একহাতে। সেইসঙ্গে ছিল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া। তবে এসবের জন্য পতাকা ওড়ানো বন্ধ হয়নি, প্রতিবছর ১৫ই আগষ্ট আর ২৬শে জানুয়ারী বাড়ির সবাইকে জড়ো করে ছাদে পতাকা তোলা হত’’-মাসীমা স্মৃতিচারণ করে চলেন। সংসারের সব কাজ সামলে নিজের তিন ছেলে ও তিন মেয়েকে মানুষ করেছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি নিজে হাতে ছেলেমেয়েদের শিখিয়েছেন কাগজ কেটে ঘুড়ি তৈরী, কাগজের মন্ড থেকে মুখোশ ও নানা খেলনা বানানো, ক্লে মডেলিং, সুপুরি পাতার সুতো থেকে রাইটিং প্যাড, টুপি, ম্যাট বানানো, তার দিয়ে বুনে প্রজাপতি, পরীর ডানা তৈরী, রাংতার গয়না, রঙীন কাগজ কেটে শিকলি বা পাতাকা তৈরী করা অথবা কালীপুজোয় বাজী পোড়ানো। মাসিমার নিজের শখ ছিল দেশ বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ আর পুরনো খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহ করা। স্থানীয় মণিমেলার নাটকের সময় একা হাতে প্রায় একশো খুদে অভিনেতার হাতি, ঘোড়া, বাঘ এসব মুখোশ বা হাতে সেলাই করে নাটকের পোশাক নিজেই বানিয়ে দিতেন। অদ্ভুত স্মৃতি শক্তি মাসীমার। দেশ বিদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তি, মণীষী বা নিজের জীবনের অনেক তুচ্ছ কিংবা মূল্যবান ঘটনার কথা পুংখানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করতে পারেন আজও অনায়াসে। তাঁর সম্মোহনী জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতে পাড়াপড়শী ছেলেবুড়ো সকলেই প্রভাবিত হতেন। জীবনকে তিনি উপভোগ করেছেন গানে গল্পে, কবিতায় আরো নানা নান্দনিক উপাদানে - পরিপূর্ণভাবে। সেই আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছেন সকলের মধ্যে। তিনি আরও অনেক বছর এই প্রখর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকুন আমাদের মধ্যে এই কামনা করি।

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

শতবর্ষে বীণা দাস

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে সমাবর্তন উৎসব। উপস্থিত তৎকালীন গর্ভনর স্ট্যানলি জ্যাকসন। হঠাৎ গুলির আওয়াজ, লক্ষ্য গভর্নর কিন্তু তাঁর কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে গেল। সকলে অবাক হয়ে দেখল গুলি চালাছেন একজন মহিলা, হাতে উদ্যত রিভলবার। পরপর কয়েকটা গুলি চালিয়ে বন্দী হলেন তিনি। বিচারে ন’বছর সশ্রম কারাদন্ড হয় তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সাড়া ফেলে দেওয়া এই ঘটনার নায়িকা বাংলার অগ্নিকন্যা বীণা দাস। যাঁর বাবা বেণীমাধব দাস ছিলেন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু, মা ছিলেন সরলা দেবী। ১৯১১ সালের ২৪ আগষ্ট চট্টগ্রামে জন্ম বীণার। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী বীণা ছোট থেকেই খদ্দর পরতেন ও চরকা কাটতেন। কলকাতায় কলেজে পড়াকালীন তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। যে রিভলবারটি দিয়ে জ্যাকসনকে গুলি করেছিলেন সেটা তাঁকে দিয়ে ছিলেন কল্পনা দাশগুপ্ত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী বীণা ১৯৩৯ সালে জেল থেকে মুক্তির পর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হন। আবার ’৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যান। ১৯৪৬-এ মুক্তি পেয়ে নোয়াখালিতে সুচেতা কৃপালনীর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রক্ষার কাজে সচেষ্ট হন ও একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৪৬-৫১ পর্যন্ত বিধানসভার সদস্য বীণার সঙ্গে বিয়ে হয় স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীশ ভৌমিকের। এরপর তিনি দেশসেবার নানা কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এমনকি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যশোহর সীমান্তে গিয়ে মুক্তিফৌজকে নানাভাবে সাহায্য করেন। ১৯৮৬ সালে হৃষিকেশ-এ মৃত্যু হয় বীরাঙ্গনা এই বিপ্লবীর। আজকের প্রজন্ম তাঁকে হয়ত মনে রাখেনি কিন্তু ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন বাংলার এই অগ্নিকন্যা।

বিশেষ কারণে
‘যাদের নিয়ে হাওড়ার ইতিকথা’
ও ‘ফিরে দেখা - জেলা হাওড়া’
এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল না,
পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পত্রিকার প্রাপ্তিস্থান

ডুমুরজলা ঃ সংবাদ সংস্থা, এইচ.আই.টি. কোয়াটার।
আমতা ঃ আমতা প্রগতি জেরক্স সেন্টার।
সেহাগড়ি ঃ সেহাগড়ি সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্র, (সেহাগড়ি মোড়)।
জয়পুর ঃ মডার্ন কম্পিউটার সেন্টার (জয়পুর থানার বিপরীতে)।
অমরাগড়ী ঃ আলিজসন্ বুক প্যালেস (অমরাগড়ী মেনকা স্মৃতি বিদ্যা মন্দিরের পাশে)
ঝিখিরা ঃ অমিত রায়।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কিছু কৃতী বাঙালি চেয়ারম্যান

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম গঠিত হয় ১৮২৬ সালে (সরকারী আদেশনামা নং ৪১৭৭ তারিখ ৭/১১/১৮৬২)। সেই কমিটিতে ছিলেন মাত্র তিনজন বাঙালী - রাজমোহন বসু, গোপাললাল চৌধুরী ও ক্ষেত্রমোহন মিত্র। তখন কোন ওয়ার্ড ছিল না কেবল কয়েকটি জায়গা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল যেমন বালি, নিশ্চিন্দা, অভয়নগর, ঝোড়হাট, বাঁকড়া, সাতাশী, একসরা ইত্যাদি। ১৮৮৩-তে যে বোর্ড গঠন হয় তার এগারো জন সদস্যের মধ্যে ঐ তিনজন বাঙালিই ছিলেন। ১৮৮৪ সালে ১০টি ওয়ার্ড গঠিত হয়। বোর্ডে বাঙালির অন্তর্ভুক্তি বাড়ে। ক্রমশ ওয়ার্ডের পরিধি বেড়ে ১৯৩২ সালে ৩০টি ওয়ার্ডে পরিণত হয়। কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ছিলেন প্রথম বাঙালি ভাইস চেয়ারম্যান (২৪.০৩.১৮৮৬-১৮.০৮-১৮৮৬) প্রকৃতপক্ষে বাঙালি চেয়ারম্যানদের আধিপত্য শুরু হয় ১৯১৬ সাল থেকে। আমরা পত্রিকার স্বল্প পরিসরে সেই সময়কার কিছু বাঙালি চেয়ারম্যানের হাতে মিউনিসিপ্যালিটির যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল সেগুলি অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি অতীতকে স্মরণ রাখার জন্য।

মহেন্দ্রনাথ রায় (১৯.০৪.১৯১৬ - ৩১.০৩.১৯২০)

● প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু হয় ১৫ জানুয়ারী ১৯১৮ থেকে।

● হরিপদ চৌধুরী একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যানুয়েল প্রস্তুত করেন।

● স্বাস্থ্য বিভাগ ঢেলে সাজানো হয়। কাঁচা রাস্তা, ড্রেন, রাস্তার দুপাশে অবৈধ দোকানপাট, বস্তি উন্নয়ন প্রভৃতি সম্পর্কে উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং ১৯১৭ সালে হেলথ অফিসারের পরিবর্তে ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

● ১৯১৬ আগষ্ট-এ সার্ভে দপ্তর খোলা হয় এবং দু'বছরের মধ্যেই সার্ভের কাজ শেষ হয়।

● লাইসেন্স দপ্তরে নিয়োগ (অক্টোবর ১৯১৭) শুরু।

● আইন, জরিপ প্রভৃতি বিভাগ ঢেলে সাজানো হয়।

● সমস্ত পাকা রাস্তায় ইলেকট্রিকের আলো চালু হয়, বস্তিগুলিতে তেলের আলোর ব্যবস্থা করা হয়।

● ১৯১৬-য় শহরে গ্যাসের আলোর দিন শেষ হয়ে গেল।

● শহরের সীমানা স্পষ্টভাবে পুর্নির্ধারিত হয়। ১৯১৮ সালে ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়।

চারুচন্দ্র সিংহ (১.৪.১৯২০-২০.৮.১৯২৮)

● চারটি প্রাইমারী স্কুল খোলা হয় যেগুলি ছিল অবৈতনিক। আরও কয়েকটি স্কুল খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯২৮-এ স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫টি।

● খালপাড়ের জমি চাষের কাজে ও ইঁট ভাটা তৈরিতে Lease দেওয়া হয়।

● পূর্ণ সময়ের Assessor নিয়োগ করা হয়।

● ১৫ ডিসেম্বর ১৯২২ থেকে কমিশনারদের মিটিং-এর বিবরণ প্রেসকে জানানোর রীতি চালু হয়।

● বেলিলিয়াস পার্ক অধিগ্রহণ ও হাওড়ার প্রথম কলেজ হিসাবে ১৯২৪ সালে নরসিংহ দত্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়।

● স্কুলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজে হেলথ অফিসার নিয়োগ।

● গোপন ব্যালটে ভোট প্রথা চালু হয় এবং প্রথম পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৫-এর মার্চ মাসে।

● শহরের পানীয় জল প্রেরণ ও দমকলের জন্য জলাধার নির্মাণ।

● 'দাই' প্রথার অবসান, শিক্ষিত ধাত্রীবিদ নিয়োগ।

● বাকল্যান্ড ব্রীজের রাস্তা, পিচ ঢালা রাস্তায় পরিণত হয়।

বরদাপ্রসন্ন পাইন (২১.৮.২৮-১.৩.৩২)

● বাঁশতলা ঘাটের পরিবর্তে একটি নূতন শ্মশান ঘাটের পরিকল্পনা নেওয়া হয় যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

● ১৯২৯ সালে ২টি নতুন অবৈতনিক চিকিৎসালয় খোলা হয়। এর আগেছিল মাত্র একটি।

● লরিতে করে Night Soil ফেলার ব্যবস্থা চালু হয়।

● আরও একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়।

খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (২.৩.৩২-৪.১২.৩৩)

● ১.১০.১৯৩২-এ নতুন পৌর আইন চালু হয়।

● ১.৯.১৯৩২--এ.সি.ই.এস.সি.-র সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী শহরে আলো বাবদ খরচা ২,২১,২৪১ টাকা থেকে কমে ১,৬০,২৪১ টাকা হয়। শহরে আলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

● প্রথম মেয়েদের অবৈতনিক পৌর বিদ্যালয় চালু হয়।

● ১.১২.৩২ থেকে ওয়ার্ড কমিটি তুলে দেওয়া হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত (৫.১২.১৯৩৩-৩.৫.১৯৩৮)

● বেলগাছিয়া ও নস্করপাড়ায় দুটি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন হয়।

● রায়বাহাদুর হাজারিমল দুধওয়ালা কাজিডাঙ্গায় একটি উদ্যান নির্মানের জন্য ৫বিঘা জমি দান করেন। সেটি 'দুধওয়ালা পার্ক' নামে পরিচিত হয়। শম্ভু হালদার লেনে আর একটি নতুন পৌর উদ্যান করা হয়।

● ১৫ হাজার টাকা ব্যয়ে শহরে নানা স্থানে অনেকগুলি টিউবওয়েল বসানো হয়।

● যাদবপুর টি.বি. হাসপাতালে গরীব হাওড়াবাসীদের জন্য চারটি ফ্রি বেড সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

● হাওড়া ব্রীজের ট্যাক্স পুর্ননির্ধারিত হয়।

● নবনিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য নতুন পে স্কেল চালু হয়।

● এক্সিকিউটিভ অফিসার পদটির প্রবর্তন হয়।

● ১৯৩৬ সালে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে টাউন হলে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

বরদাপ্রসন্ন পাইন (৪.৫.১৯৩৮-মে ১৯৪৫) পুনর্নির্বাচিত)

● রেল থেকে পৌর আয় বৃদ্ধি।

● হাওড়া - আমতা ও হাওড়া - শিয়াখালা লাইনের ময়দান ও পঞ্চানন তলা স্টেশন দুটি সরিয়ে নেওয়া হয়। তেলকল ঘাটের পরিবর্তে কদমতলা থেকে লাইট রেলওয়ে চালু হয়।

● মেয়েদের আর একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা। মোট পৌর স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টি।

● সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য সালকিয়ার শ্রীমতি সত্যবালা দেবী একলক্ষ টাকা দান করেন।

● ১.৪.৪১ লাইসেন্স অফিসার নিয়োগ হল।

● ব্যাঁটরা ও নন্দীবাগানের 'ময়লা ফেলার' কেন্দ্রগুলি অবলুপ্তি।

● টাউন হলে সুভাষচন্দ্রের নাগরিক সম্বর্ধনা।

শৈলকুমার মুখার্জী (মে ১৯৪৫-১.৭.১৯৫১)

● আরও একটি প্রাইমারী স্কুল চালু হয়।

● শহরে কর ব্যবস্থার পুর্নবিন্যাস ঘটে।

● 'Night Soil' থেকে কম্পোস্ট সার তৈরির প্রথা চালু হয়।

● বেওয়ারিশ মৃতদেহ পোড়ানোর অমানবিক প্রথা বদলে হিন্দু সৎকার সমিতির হাতে মানবিক ভাবে দাহ বা কবর দানের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়।

● কর্মচারীদের জন্য পে রিভিশন প্রথা চালু হয়।

● বেলগাছিয়ায় নতুন ভাগাড় নির্মাণ ও কম্পোস্ট সার নির্মাণ চালু হয়।

● সাফাইকর্মীদের জন্য জেলেপাড়ায় আবাসন ও পানীয় জলের ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

● আরও কিছু ডিপ টিউবওয়েল বসানো ও শহরের গলিগুলিতে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা হয়। শ্রী মুখার্জী হাজার টাকা মূল্যের মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণবয়ব তৈলচিত্র নিজ ব্যয়ে দান করেন।

● টাউন হলে প্রথম অলবেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

● লক্ষ্মীদেবী জয়সোয়াল হাসপাতাল ও সত্যবালাদেবী হাসপাতাল চালু হয়।

● ভারতের স্বাধীনতা উপলক্ষে অশোকস্তম্ভযুক্ত একটি চমৎকার মিনার প্রতিষ্ঠা হয় মূল ফটকের সামনে।

● প্রচলিত পৌর প্রতীক বদলে নতুন পৌর প্রতীক চালু হয় ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে।

● মহাত্মা গান্ধী ও রাজকুমারী অমৃতা কাউরকে টাউন হলে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত (২.৭.১৯৫১-২০.৪.১৯৫৪)

● হাওড়ার প্রথম ট্রাফিক সিগনাল ব্যবস্থা চালু হয়।

● সাফাইকর্মীদের জন্য জেলেপাড়ায় ৩০টি ঘরের আবাসন তৈরীর কাজ শেষ হয়।

● শহরে আরো বেশকিছু ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়।

● আন্দুলের ভাগাড়টির বিলুপ্ত ঘটিয়ে বেলগাছিয়া ভাগাড়ের কাজ সমাপ্ত হয়।

● শহরের গলিগুলিতে আরও আলোর ব্যবস্থা ও বস্তিগুলির উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয়।

● পৌর নির্বাচনে প্রথম প্রতীক প্রথা চালু হয়।

সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ও শিবনাথ চক্রবর্তী

তথ্যসূত্র ঃ Howrah Civic Companion by J. Bonnerjee & Municipal Manual by Haripada Chowdhury

'শিক্ষা আনে চেতনা'

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতালাভের পর দীর্ঘ ছয় দশক কেটেগেছে। কিন্তু যে স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম তা কি সত্যিই অর্জিত হয়েছে? যে সব অমর শহীদ বৃটিশ পুলিশের গুলি, লাঠি নির্বিচারে হজম করে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছেন, আন্দামানে নির্বাসন দন্ড ভোগ করেছেন, যেসব বীর সেনানী পুলিশি অত্যাচারে অন্ধ বা পঙ্গু হয়ে জীবন কাটিয়েছেন তাঁরা কি চেয়েছিলেন সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, মৌলবাদীদের তান্ডব, অর্থসর্বস্ব ভোগপিপাসু নিরালম্ব জীবন ও সংকীর্ণ হীনমন্য রাজনৈতিক দলাদলিই হবে এই স্বাধীনতার পরিণাম? মুক্তিপথের দিশা দেখানোর নায়ক আজ আর নেই। উপযুক্ত কান্ডারীর অভাবে স্বাধীন দেশে আজও বহু মানুষ অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, অপুষ্ট ও সাম্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত। শাসকের দমন পীড়ন আজও অব্যাহত।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুধু শহরে নয়, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বহু মানুষ অভুক্ত, অর্ধভুক্ত থেকেও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন, জেল খেটেছেন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও আরও নানা অহিংস ও সহিংস সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রচারের আলোর বৃত্তের বাইরে থাকা এই দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী উপযুক্ত গবেষণার অভাবে অধরাই থেকে গেছে। সামান্য দু'একজন গবেষক তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যেটুকু লিপিবদ্ধ করেছেন তাই আমাদের ভরসা। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলেও এটা সত্যি যে আজও এশহরে বিপ্লবীদের কোন স্মারক, প্রচার পুস্তিকা, তৎকালীন পুলিশ রেকর্ডের কপি, বিচারের কাগজপত্র, জীবনী ও অন্যান্য উপাদান নিয়ে সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়নি যাতে জেলার মানুষ জানতে পারেন সেই অজানা সংগ্রামের কাহিনী।

এই স্বাধীনতাবর্ষে জেলা প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন এমন একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হোক।

এই সংখ্যায় স্বল্প পরিসরে আমরা স্মরণ করেছি হাওড়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের কয়েকজন দেশহিতব্রতী সৈনিককে সেই সঙ্গে বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা জানাই সেই সমস্ত হাওড়াবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যাঁদের অকৃপণ ও সার্থক জীবন দানে সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস।

হাওড়ার কয়েকজন স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলার বিশেষ ভূমিকা ছিল। শুধু শহর হাওড়া নয় বালী, বেলুড়, লিলুয়া থেকে শুরু করে রসপুর, উদয়নারায়ণপুর, মাজু, খালোড়, সিংটি, গড়ভবানীপুর, উলুবেড়িয়া, বাগনান, খালনা, মুগকল্যান, জয়পুর, ঝিখিরা, অমরাগড়ী, বাউড়িয়া, নলপুর, কানুপাট, নুন্টিয়া, ডোমজুড়, পাঁতিহাল, শ্যামপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য শ্রমিক কৃষক, সাধারণ মানুষ, গৃহবধূ, ছাত্র-যুব এমনকি ছোটরাও নানা ভাবে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। দীর্ঘ সংগ্রাম, অত্যাচার ও লাঞ্ছনার কাহিনী নিয়ে কোন বিস্তৃত তথ্য বা ইতিহাসভিত্তিক গবেষণা হয়নি এটি এ জেলার দুর্ভাগ্য। যা আছে তা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় লেখা কিছু বই বা প্রবন্ধ যেগুলি থেকে জেলার মুক্তিসংগ্রামের আন্দোলনের একটি মোটামুটি রূপরেখা পাওয়া যায়। এটিও চরম দুর্ভাগ্য যে এই সমস্ত বই বা প্রবন্ধ আজ প্রায় দুষ্পাপ্য হয়ে পড়েছে, অথচ এগুলির পুর্নমুদ্রণ বা সংকলন করা আশু কর্তব্য। গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে প্রফুল্ল দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ', দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী রচিত 'স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা', জয়কেশ মুখার্জী রচিত 'কেউ ভোলে কেউ ভোলেনা', বিপুলকৃষ্ণ পাল সম্পাদিত 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম', নিতাই মন্ডল, শিবনাথ ব্যানার্জী ও বিভূতি ঘোষ এর জীবনী সম্বলিত কিছু পুস্তিকা, অমিয় ঘোষ রচিত 'হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী' ও আরো এরকম কিছু প্রবন্ধ। শরৎচন্দ্র দীর্ঘ দিন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তখন হাওড়া জেলায় সুভাষ পন্থী ও শাসমল পন্থী কংগ্রেসের দুটি গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। এছাড়া ছিল আরও কয়েকটি দল। পৃথক কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনও ছিল। সেসময়কার উল্লেখযোগ্য বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন পুলিন রায় (বারীন ঘোষ তাঁকে একটি তরবারি দিয়ে ছিলেন), প্রবোধ বসু, তারাপদ মজুমদার, শিবনাথ ব্যানার্জী, কে.সি. মিত্র, বরদাপ্রসন্ন পাইন, সুশীল ব্যানার্জী, বিপিন বসু, বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, বিভূতি হাজরা, খগেন গাঙ্গুলী, শান্তি দাশগুপ্ত, ভোলানাথ দাস, সুশীল মুখার্জী, হরিপদ রায়চৌধুরী, সতীশ মিত্র, বুদ্ধদেব মুখার্জী, সন্তোষ ঘোষাল, চন্ডিদাস ঘোষ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, অজিতকৃষ্ণ মল্লিক, দুলাল দত্ত, নিশিকান্ত ব্যানার্জী প্রমুখ আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে বিপুল সেনানীবৃন্দের নাম উল্লেখ সম্ভব নয়। তাঁদের সকলকেই বিনম্রচিত্তে জানাই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এই সংখ্যায় আমরা স্মরণ করেছি সেই অগণী সৈনিকদের সামান্য কয়েকজনকে যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

ননীবালা দেবী ঃ আজ ভেবে অবাক লাগে যে একসময় বালি দক্ষিণপাড়ার মানুষজন ১৯১৯ সালে ভারতের প্রথম রাজবন্দীকে জেল থেকে মুক্তির পর আশ্রয় দেয়নি। তাঁর ঠাঁই হয়েছিল উত্তর কলকাতার একটি ঘুপচি ঘরে। অল্প বয়সে চরম পুলিশি নির্যাতনের শিকার ননীবালা দেবী ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশানে ধৃত ভারতের প্রথম মহিলা রাজবন্ধী। সূর্যকান্ত (ভট্টাচার্য্য) বন্দোপাধ্যায় ও গিরিবালা দেবীর কন্যা ননীবালা দেবীর জন্ম ১৮৮৮ সালে বালির দক্ষিণপাড়ায়। ১১ বছরে বিবাহ, ১৬ বছরে বৈধব্য। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিসিমা, ননীবালা বালি ছেড়ে রিষড়ায় গিয়ে বিপ্লবীদের গোপন ডেরায় থেকে সাহায্য করেছিলেন কারণ ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে কোন মহিলা ছাড়া বিপ্লবীরা বাড়ী ভাড়া নিতে পারতেন না। ওই আশ্রয়ে অমরেন্দ্রনাথ ছাড়া থাকতেন ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, মন্মথ বিশ্বাস, নলিনী কর, সতীশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ। ১৯১৪-য় কলকাতায় যখন রডা কোম্পানীর মাউজার পিস্তল লুঠ হয় তার একটি যায় স্ট্যান্ড রোডের 'শ্রমজীবী সমবায়' দোকানের মালিক রামচন্দ্র মজুমদারের হাতে। তিনি গ্রেপ্তার হলে ননীবালা দেবী শাঁখা সিন্দুর পরে জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সেই পিস্তলের খোঁজ নিয়ে আসেন। পুলিশ জানতে পারে, ধরা পড়ার ভয়ে ননীবালা তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদার সাহায্যে কলকাতা থেকে পেশোয়ায় পালিয়ে যান। ১৯১৭-য় কলেরায় আক্রান্ত ননীবালাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ কাশী জেলে নিয়ে আসে। সেখান থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেল। প্রবল দৈহিক অত্যাচার করেও এবং তাঁর বাবাকে দিনের পর দিন বসিয়ে রেখে জেরা করেও কোন তথ্য পুলিশ তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। প্রেসিডেন্সী জেলে ননীবালা অনশন শুরু করলে স্পেশাল সুপার গোল্ডি তাঁকে অনশন ভাঙ্গতে অনুরোধ করেন। ননীবালা বলেন তাঁকে মা সারদার কাছে পৌঁছে দিলে তিনি খাবেন। গোল্ডি তাঁকে একটি দরখাস্ত লিখতে বলেন। লেখা হলে ননীবালার সামনে গোল্ডি সেটা ছিঁড়ে ফেললে ক্রুদ্ধ ননীবালা গোল্ডির গালে প্রচন্ড এক চড় মারেন। জেলখানায় ২১দিন অনশন করার পর তাঁকে রাজবন্দীর মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯১৯-এ মুক্তির পর বাবার প্রচেষ্টায় তিনি উত্তর কলকাতার এক ঘুপচি ঘরে প্রবল অর্থকষ্টের মধ্যে জীবন কাটান। ১৯৬৭ সালে এলাকায় 'সাধু মা' নামে পরিচিত ননীবালার মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলার একটি পত্রিকা 'উত্তর দর্পণ' ননীবালা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে কিন্তু হাওড়ায় তাঁর স্মৃতি আজও মলিন।

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ হাওড়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধাপুরুষ হরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯২-এর ৭ই জুলাই। পিতা সাতকড়ি ও মা শরৎকান্তী দেবী। মাত্র ১৩বছর বয়সে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং অনুশীলন সমিতিতে যোগদান। সুরেন্দ্রনাথের বিডন স্কোয়ারের সভায় যোগদান। হাওড়া জেলা স্কুলের ছাত্র হরেন্দ্রনাথ থাকতেন Y.M.C.A. -ত। ১৯১৪-১৯ তিনি লন্ডনে ছিলেন। সেখানে নানা জায়গায় কাজ করে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা লাভ করেন (লন্ডনের কিংস কলেজের ছাত্রও ছিলেন)। বিদেশে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯২২ এ দেশে ফেরেন। দেশে ফিরে শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন, প্রতিষ্ঠা করেন হাওড়া সেবা সংঘ। তিনি বিপিন বসু, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ননী ভট্টাচার্য্য প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে জয়পুর, ঝিখিরা, তাজপুর, খালনা, উদয়নারায়ণপুর, আমতা, সিংটি সহ বিভিন্ন হাওড়ার গ্রামে ম্যাজিক লন্ঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশের অত্যাচারের কথা প্রচার করেন এবং জোরালো এক সংগঠন তৈরি করেন। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশন বয়কট শোভাযাত্রায়, ১৯২৯-এ শহীদ যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে ঐতিহাসিক মিছিল সবেতেই হরেন্দ্রনাথ। ১৯২৬-এ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৩০-এ লবন আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠন। তিনটি দল শিবগঞ্জে গিয়ে আন্দোলন সফল করেন। ঐ সময়ই মদের দোকান ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং, পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার। জেলা কংগ্রেস অফিস ৪নং তেলকল ঘাট রোডে খোলা হয়। গোপন প্রচার পুস্তিকার ছাপানোর দায়ে ১৯৩০-এ পুলিশের হাতে ধৃত হরেন্দ্রনাথের ১৫মাসের সশ্রম কারাদন্ড। প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী। জেলে আইন অমান্য আন্দোলন, জেল থেকে মুক্তি, 'হাওড়া ভলান্টিয়ার্স ব্যান্ডপার্টি' গঠন, ১৯৩৫-এ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯৩৮-এ কৃষক আন্দোলনে যোগদান। গঠন। ১৯৩৮ এ হাওড়া টাউন হলে জেলা ছাত্র সম্মেলন। পরের দু'বছর জেলায় বিভিন্ন আন্দোলনে ও ১৯৪০-এ রামগড় আন্দোলনে যোগদান। হলওয়েন্ট মনুমেন্ট অপসারণে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ। ১৯৪১-এ শ্যামপুর ত্রাণকার্য পরিচালনা। আবার গ্রেপ্তার, ১৯৪৬-এ জানুয়ারীতে মুক্তি, ১৯৪৭-এর ১৫ আগষ্ট আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী দেবনাথ দাসের পরিচালনায় কলকাতায় বিশাল মিছিল সংগঠন, ১৯৫০-এর ২২ ফেব্রুয়ারী মৃত্যু। নেতাজী তাঁকে ঠাট্টা করে ডাকতেন 'মুসোলীনি' বলে। হরেন্দ্রনাথের সাংগঠনিক কাজে তুষ্ট হয়ে নেতাজী বলেছিলেন 'হাওড়া আমার আর একটি কেল্লা'।

নিতাই মন্ডল ঃ জন্ম ১৯০১-এ উদয়নারায়ণপুরের কানুপাট গ্রামে। পিতা - অবিনাশ মন্ডল, মা- তারিণী দেবী। প্রাথমিক শিক্ষা গাঁয়ের চন্ডী বাঁড়ুজ্যের পাঠশালায়। পরে গড় ভবানীপুরের ভোলানাথ বাড়ুই-এর কাছে দর্জির কাজ শেখেন। থলিয়া বাজারে স্বদেশীবাবুদের ম্যাজিক লন্ঠনসহ বক্তৃতা শুনে দেশপ্রেমে দীক্ষা ও কংগ্রেসে যোগদান। ১৯২০ নাগাদ সংগঠনের কাজে ঘুরতে হল হাওড়ার গ্রামেগঞ্জে। পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। আফিমের দোকানে পিকেটিং চলাকালীন পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার, উলুবেড়িয়া জেলে ছ'মাসের কারাদন্ড। ১৯২০-২৬ সত্যাগ্রহ, অবস্থান ধর্মঘট, বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনেও পুরোভাগে নিতাইবাবু। হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে পরিচয়। ১৯২৬-এ গ্রেপ্তার। ছ'মাসের কারাদন্ড, প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেল, পরে আলিপুর জেলে। ১৯২৭-এ আবার গ্রেপ্তার। ছ'মাসের কারাদন্ডে আলিপুর জেলে জেলারকে পুকুরের জলে চুবিয়ে দেন, ফলে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত। ১৯২৮ সালে সংগঠন পোক্ত হচ্ছে আমতা, গাজিপুর, পাইকবাসা, ঝিখিরা, জয়পুর, থলিয়া, সোনাতলা, মানশ্রী, পাঁচারুল, খিলা, পেঁড়ো, বরুইপুর - সব জায়গাতেই নিতাই মন্ডল। আবার গ্রেপ্তার, আট মাসের জেল। ১৯৩০-এ হরেন ঘোষ জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক, সভাপতি শরৎচন্দ্র। গ্রেপ্তার করে নিতাই মন্ডলকে পাঠানো হল বহরমপুর জেলে। বন্দীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে দীর্ঘ অনশন। ১৯৩১-এ বন্দীমুক্তির দাবিতে আন্দোলন। ১৯৩২-এ হাওড়া কোর্টে জাতীয় পতাকা তোলার দায়ে আবার গ্রেপ্তার। এবার হিজলি জেলে। ৪২ দিনের অনশন, পুলিশের ব্যাপক অত্যাচারে মাথার গোলমাল দেখা দেয়। অর্ধেন্দু চৌধুরী শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। ১৯৩৩-৪৮ কৃষক আন্দোলনের পুরোভাগে নিতাইবাবু, কুৎখামারী প্রথা ও বাবুদি প্রথার অবসানের জন্য দীর্ঘ আন্দোলন। স্বাধীনতার পরে শোলবাগা মৌজায় প্রথম চেন সার্ভে করান নিতাইবাবু। আন্দোলনের জেরে জমিদারদের পরাজয়। সুভাষচন্দ্রের কট্টর অনুগামী নিতাই মন্ডলের শ্লোগান ছিল 'লাঙল যার জমি তার'। ১৯৩৯-এ ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান, ১৯৪০-এ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনের পুরোভাগে। আবার ৪২'-এ আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান। '৪২-এ শ্যামপুরে ঝঞ্ঝাবিধ্বস্থ এলাকায় ত্রাণকার্য পরিচালনা। '৪৪-৪৭ কৃষক আন্দোলনের হোতা। চাষীরা তাঁকে বলত - 'আমাদের বাবা'। স্বাধীনতার পর গুরুর নামে কানুপাটে 'হরেন্দ্র শিক্ষায়তন' প্রতিষ্ঠা। তাঁরই উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'নির্ঝরিণী সরকার বালিকা বিদ্যালয়' এবং 'হরেন্দ্র পাঠাগার'। ১৯৫৩-১৯৫৯ দামোদরের বন্যারোধে নিম্ন দামোদর সংস্কার আন্দোলন নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। যিনি নিজেকে বলতেন 'নেতাজীর সেপাই', সেই নিতাই মন্ডল ১৯৬৬ সালে জানুয়ারী মাসে হঠাৎ একদিন তাঁর গুরুর মতোই আচমকা নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

এরপর ৪র্থ পাতায়

বিভূতি (নানু) ঘোষ ঃ উলুবেড়িয়ার বিখ্যাত লাঠিয়াল অতুল ঘোষের পুত্র নানুর জন্ম ১৯১৩র দোল পূর্ণিমায়। প্রাথমিক শিক্ষা নতিবপুর-এ। উলুবেড়িয়া হাইস্কুলের পড়াকালীন লাঠী খেলা, কুস্তি, যুযুৎসু, বক্সিং শিক্ষা। ১৯৩০-এ লবণ আন্দোলনে যোগদান, আফিমের দোকানে পিকেটিং, দমদম জেলে কারাদন্ড।

১৯৩২-এ অসহযোগ আন্দোলনে গ্রেফতার, হিজলী জেলে আটক। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। ১৯৩৩-৩৭ হাওড়া জেলায় সশস্ত্র সংগঠন গড়ার দায়িত্বে তিনি। ১৯৩৯-এ ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান। পরের বছর রামগড় অধিবেশনে সংগঠকের ভূমিকায়। ১৯৪২ এ আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান, তাঁর মাথার মূল্য ছিল দশহাজার টাকা। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯-এ 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' আন্দোলনে যোগদান। স্বাধীনতার পর জনসেবায় নিয়োজিত। বন্যায়, খাদ্য আন্দোলন ও দুর্গত মানুষের সেবায় সারাজীবন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ১১ আগষ্ট ১৯৭৫-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতের জাতীয় পতাকার বিবর্তন

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় রাজ রাজারা তাদের শক্তি শৌর্যের প্রতীক হিসাবে পতাকা ব্যবহার করে আসছেন। মৌর্য ও গুপ্ত রাজারা ব্যবহার করতেন গরুড় ধ্বজ পতাকা, চিতোরের রানা প্রতাপ সূর্যের ছবি দেওয়া লাল রঙের চাঙ্গি পতাকা, মারাঠা বীর শিবাজীর 'ভাগবা-ঝান্ডা' ইত্যাদি। এগুলি সবই অঞ্চল ভিত্তিক সম্রাজ্যের পতাকা। পতাকা ঐক্যবদ্ধ ভারতীয়তার প্রতীক হয়ে ওঠে সিপাসী বিদ্রোহের সময়।

ভারতের জাতীয় পতাকার বহুবর্ণ ইতিহাসের সূত্রপাত ১৮৫৭ সালে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ ভারতবাসীর স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে সবুজ এবং সোনালী রঙের ওপর পদ্ম এবং হাতে গড়া রুটি আঁকা পতাকা উত্তোলন করেন।

১৯০৬ সালে ভগিনী নিবেদিতা নিজে গেরুয়া রঙের ওপর পতাকার নকশা করেন। এই চারধারে একশ আট শিখা। ঠিক মাঝখানে হলুদ বজ্র যার বাঁদিকে 'বন্দে' এবং ডানদিকে 'মাতরম' লেখা।

১৯০৬ সালে কলকাতায় প্রথম তিনরঙা পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকায় সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের তিনটি আড়াআড়ি ভাগ ছিল। সবুজের ওপর আটটি আধফোটা পদ্ম। হলুদের ওপর গাঢ়নীল রঙে 'বন্দেমাতরম' লেখা এবং নীচে সূর্য ও চাঁদ। ১৯০৬ সালের ৭ আগষ্ট কলকাতার পার্সীবাগানে স্কোয়ারে এই পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়।

১৯০৭ সালে ১৮ আগষ্ট জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মাদাম কামা ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো পরিকল্পিত একটি তিনরঙা পতাকা প্রদর্শন করেন। পতাকায় গেরুয়া, হলুদ ও সবুজ রং ছিল। উপরের গেরুয়া রঙে আটটি আধ ফোটা সাদা পদ্ম, মাঝে দেবনগরীতে লেখা 'বন্দেমাতরম', তলায় সবুজ রঙে একদিকে চাঁদ তারা, অন্যদিকে সূর্য। সূর্য হিন্দুর এবং চাঁদ তারা মুসলমানদের প্রতীক।

১৯১৭ সালে হোমরুল আন্দোলনের সময় বালগঙ্গাধর তিলক এবং শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য একটি নতুন পতাকা তৈরি করেন। পতাকায় লাল ও সবুজ রঙের সমান আকারে নয়টি ডোরা ছিল - পাঁচটি লাল এবং চারটি সবুজ। পতাকার বাঁদিকের কোনায় ইউনিয়ন জ্যাক এবং ডানদিকের খোলা দিকে চাঁদ-তারা। পতাকার ওপর সপ্তর্ষি মন্ডলের চিহ্ন।

১৯২১ সালে গান্ধীজী তৈরী করেন সাদা, সবুজ ও লাল রঙের তিনরঙা পতাকা। এর মাঝখানে ছিল চরকা। তিনটি রঙ তিনটি আলাদা সম্প্রদায়ের প্রতীক।

১৯৩১ সালে গান্ধীজীর পতাকার কিছুটা পরিবর্তন করে তৈরি হল নতুন পতাকা যাতে গেরুয়া সাদা ও সবুজ রং। উপরে গেরুয়া, মাঝে সাদা এবং নীচে সবুজ রঙ। সাদার মাঝে চরকা। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে ১৫ আগষ্ট তারিখে ভারত স্বাধীন হবে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরীর জন্য একটি কমিটি তৈরি হয়। ২২ জুলাই কমিটি একটি 'তেরঙা' পতাকা তৈরি করে যা ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়।

ভারতীয় পতাকার তিনটি রঙ তাই একে 'তেরঙা' বলে। উপরে গেরুয়া বা সাহস, ত্যাগ ও স্বার্থহীনতার প্রতীক। মাঝের সাদা রঙ পবিত্রতার প্রতীক এবং নীচে সবুজ রঙ সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। সাদা অংশে আছে ২৪টি কাঁটাওয়ালা নীল রঙের অশোক চক্র। নীল রঙ সমুদ্র ও আকাশের প্রতীক। অশোকচক্র দেশের অবাধ অগ্রগতির প্রতীক এবং চাকার ২৪টি কাঁটা বোঝায় এই জাতি সর্বক্ষণের।

জহর চট্টোপাধ্যায়

পতাকায় কুইজ

১। পতাকার চর্চাকে কী বলে?
২। কোন দেশের পতাকায় সে দেশের মানচিত্র আঁকা আছে?
৩। কোন দেশের পতাকা সবচেয়ে প্রাচীন?
৪। কোন দেশের পাতাকার দু'পিঠ দু'রকম?
৫। কোন কোন দেশের পতাকা বর্গাকার?
৬। পৃথিবীতে একটি বাদে সব দেশের পাতাক সমকোনী চতুর্ভূজাকার। ব্যতিক্রমী দেশটি ও তার পতাকার আকৃতি কি?
৭। কোন দেশের পতাকা প্রথম চাঁদের মাটিতে পৌঁছায়?
৮। কোন দেশের পতাকায় ব্রহ্মান্ডের ছবি আছে?
৯। অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের পতাকা প্রায় একই রকম। দু'দেশের পতাকায় কি পার্থক্য?
১০। কোন দেশের পতাকা থেকে 'রেডক্রসে'র পতাকার উৎপত্তি?
১১। জাতীয় পতাকায় প্রতীক হিসাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত চিহ্নটি কি?
১২। মড়ার খুলির ছবি আঁকা জলদস্যুদের পতাকাকে কি বলে?
১৩। সাদা কালো ঘর আঁকা চেকার্স ফ্ল্যাগ কোন খেলায় ব্যবহার হয়?
১৪। পৃথিবীতে জাতীয় পতাকায় কোন তিনটি রঙের ব্যবহার সর্বাধিক?
১৫। ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট জয়ের পর তেনজিং ও হিলারি কোন কোন দেশের পতাকা শৃঙ্গে পুঁতেছিলেন?

কুইজে উত্তর

১। ভেক্সিলোলজি ২। সাইপ্রাস ৩। ডেনমার্ক ৪। প্যারাগুয়ে ৫। সুইজারল্যান্ড ও ভ্যাটিকান সিটি ৬। নেপাল, দুটি ত্রিভূজ একটির ওপরে আর একটি ৭। সোভিয়েত রাশিয়ার পতাকা, ১৯৫৯ সালে লুলা-২ রাশিয়ার ছোট ছোট পতাকা চাঁদের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল ৮। ব্রাজিলের ৯। অষ্ট্রেলিয়ার পতাকায় ছ'টি সাদা নক্ষত্র আছে আর নিউজিল্যান্ডের পতাকায় চারটি নক্ষত্র যার মাঝখানে লাল রঙ ১০। সুইজারল্যান্ডের, এই পতাকার লাল ভূমিতে সাদা ক্রশ, রেডক্রশের সুইস প্রতিষ্ঠাতা এটি উলটে পতাকা বানান, সাদা ভূমিতে লাল ক্রশ ১১। নক্ষত্র ১২। জলি রজার ১৩। মেটির রেসিং-এ ১৪। লাল, সাদা ও নীল ১৫। রাষ্ট্রসংঘ, গ্রেটবিট্রেন, নেপাল এবং ভারতের পতাকা।

৩য় পাতার পর

মণীন্দমোহন চক্রবর্ত্তী

দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি হাওড়ার বাসিন্দা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মণীন্দমোহন চক্রবর্ত্তী ছিলেন এই জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অগ্রণী কর্মী। থাকতেন বৃন্দাবন মল্লিক লেনে ও পরে মধুসুদন বিশ্বাস লেনে। হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ ১৯৩৭-এ। হরেনবাবু তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। বিলেত ফেরত হরেনবাবু যে সুভাষচন্দ্রের ডান হাত একথা জানতে পারেন মণিবাবু। হরেনবাবুর জন্যই মণিবাবুকে জেলের ঘানি ঘোরাতে হয়নি। জেলা কংগ্রেস অফিস ৩১/৪, বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনে নিয়মিত যাতায়াত শুরু হল। সে সময় আন্দামানে চালান হওয়া বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন হয়। পাশাপাশি ছিল কৃষক আন্দোলন। সংগঠন জোরদার করার কাজে নেমে পড়েন মণিবাবু।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ছাড়ার পর ফরওয়ার্ডব্লক গঠন করেন। এর ছাত্র সংগঠনটির নাম ছিল Forward Bloc Students Bureau। মণিবাবু ছিলেন এর হাওড়া জেলা Committee-র সদস্য। ওঁর কাজ ছিল বিভিন্ন কলেজে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৩৯-এর ৮মে বেলিলিয়াস পার্কে সুভাষচন্দ্রের সভায় স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন মণিবাবু। রামগড়ে আপশ-বিরোধী সম্মেলনেও স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৪১-এ সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের পর হাওড়ায় তৈরি হয় Civil War Death Organisation যাঁদের কাজ ছিল যুদ্ধ বোমায় মৃতদের সৎকার করা। ৬নং ওয়ার্ডের দায়িত্ব ছিল মণিবাবুর। মণিবাবু হরেণবাবুর এতটাই বিশ্বাসভাজন যে রাত ১২টাতেও লেখালেখির জন্য ওঁকে ডেকে আনা হ'ত।

১৯৪২-৪৭ মণিবাবু নিষিদ্ধ সংগঠনের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। ওঁর কাজ ছিল গোপন সার্কুলার, চিঠিপত্র, পুস্তিকা বা আজাদ হিন্দ ফৌজের নির্দেশ ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। প্রত্যন্ত গ্রামেও তাঁকে একাজে যেতে হয়েছে বহুবার। ১৯৪৪-৪৫ সাল নাগাদ ব্রহ্মদেশত্যাগী ভারতীয়রা রিফিউজি হয়ে দলে দলে ভারতে আসতে শুরু করে। ত্রাণের জন্য তৈরি হয় National Service Core, হাওড়া স্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকদের দল চালানোর দায়িত্ব ছিল মণিবাবুর। ২৪ ঘন্টাই চলত এই ত্রাণের কাজ। ১৯৪২-৪৬ হরেণবাবু জেলে। দলের কাজকর্ম চালানোর জন্য তৈরি হল কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ। মণিবাবু এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মূল হোতা। নিয়মিত সাপ্তাহিক ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখতেন মণিবাবু। পরে হরেণবাবু সংশোধন করে দিলে তা ছাপা হ'ত পত্রিকায়। নেতাজী 'The Indian Struggle'-এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন অসিতবাবু। ধারাবাহিকভাবে এই রচনা সে সময়ে ওই পত্রিকায় ছাপা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য মণিবাবু বিলেত যান ১৯৪৯-এ। হরেণবাবুর সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয়নি। ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরবর্তীকালে প্রথমে কল্যাণী ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন।

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোঃ-- অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co. Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori, Jaypur, Howrah. **Editor - Shibnath Chakraborty. Contact No. 9800286148**